একক ৩ ❐ প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ব্যাকরণের সূত্রপাত

৩.৪ ব্যাকরণের সমস্যা

৩.৫ পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ

৩.৬ প্রাচ্যে ব্যাকরণ

৩.৬.১ বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ

৩.৬.২ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব

৩.৬.৩ ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব

৩.৭ প্রথাগত থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

৩.৮ গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব

৩.৮.১ ধ্বনিতত্ত্ব

৩.৮.২ রূপতত্ত্ব

৩.৮.৩ বাক্যতত্ত্ব

৩.৮.৪ অন্যান্য

৩.৮.৫ সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

৩.৯ বাংলা ব্যাকরণ

৩.১০ কালানুক্রমিক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১০.১ অষ্টাদশ শতাব্দী

৩.১০.২ ঊনবিংশ শতাব্দী

৩.১০.৩ বিংশ শতাব্দী

৩.১১ তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১২ বর্ণনামূলক বাংলা ব্যাকরণ

৩.১৩ সংবর্তনী সঞ্জননী বাংলা ব্যাকরণ

৩.১৪ উপভাষা তত্ত্ব ও সমাজ ভাষাতত্ত্ব

৩.১৫ বাংলা ভাষাতত্ত্ব

৩.১৬ এক নজরে বিংশ শতাব্দী

৩.১৭ সারাংশ

৩.১৮ অনুশীলনী

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

* ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত।
* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্ভব
* প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা
* প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে উত্তরণ
* আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিবর্তন
* অষ্টাদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ চর্চার বিবর্তন।

৩.২ প্রস্তাবনা

রামেশ্বর শ বলেন - ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যথেচ্ছভাবে নির্বাচিত বাক্যমধ্যে বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এমন কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিগত প্রতীক যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

এই ভাষাকে ঘিরে মানুষের জিজ্ঞাসার সূত্রপাত বহু প্রাচীন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে। ভাষা জিজ্ঞাসা-দ্যোতক একাধিক শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—যেমন শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি। এরই মধ্যে ভাষাজিজ্ঞাসা অর্থে ব্যাকরণ বা ব্যাকরণ মানে ভাষাজিজ্ঞাসা—এই ধরনের একটি সমীকরণ বহু প্রাচীন যুগ থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ধারার ভাষাজিজ্ঞাসাতেই সহজলভ্য।

এই এককে আমরা ব্যাকরণ শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করব এবং আমাদের বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকরণের দুটি প্রধান ভাগ করব—প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।

প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা যুগ থেকে গ্রিক, লাতিন বা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের ছকে ফেলে ভাষাচিন্তার বা ব্যাকরণচিন্তার বিভিন্ন বিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত হবে ভাষাবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ভাষাবিশ্লেষণ বা ব্যাকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিবর্তন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি হল তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সঞ্জননী সংবর্তনী তত্ত্ব। আমাদের আলোচনায় ইতিমধ্যেই ভাষাবিজ্ঞানের এইসব প্রসঙ্গ এসেছে। এই আলোচনা পূর্ণসত্তার জন্য বর্তমান এককে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ পর্যায় ৩ ঃ একক ১, ২, ৩)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান একাধিক তত্ত্বসমৃদ্ধ হলেও আমাদের বর্তমান পাঠক্রম যেহেতু বাংলার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ কেন্দ্রিক সেহেতু আমাদের আলোচনাতেও বর্ণনামূলক তত্ত্বই অধিক গুরুত্ব পাবে, এই এককে এবং এর পরবর্তী এককগুলিতেও অর্থাৎ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে আমরা মূলত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকেই বোঝাব।

এ ছাড়াও আমরা ধরে নেব যে প্রথাগত ব্যাকরণই হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পূর্বসূরী। প্রথাগত ব্যাকরণের বিভিন্ন সদর্থক-নঞর্থক পটভূমিকে ব্যবহার করে সূচনা সম্ভবপর হয়েছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের।

আমরা এখানে প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণচিন্তা ও তার সীমাবদ্ধতার কথা বলব ও তারপর আধুনিক ব্যাকরণের গঠন ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করব।

৩.৩ ব্যাকরণের সূত্রপাত

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তু ভাষা। ভাষা কী ? না, ভাষা এক অর্থে প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষের পড়ে পাওয়া সম্পত্তি। প্রতিটি মানুষই তার শিশুবয়সে স্বাভাবিকভাবে আপনা আপনিই তার নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে প্রচলিত ভাষাটি শিখে যায়। পবিত্র সরকারের কথা—"স্কুলে আসার আগেই আমরা যে যার ভাষা বলতে শিখে যাই। যে-কোনো মানবশিশু তিন বৎসর বয়সে তার ভাষা, অর্থাৎ পরিবেশে যে ভাষাটি বলা হয়, সেটি মোটামুটি বলতে শিখে যায়। ফলে শিশু যখন স্কুলে আসে তখন সে বলার ভাষাটিকে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে, কথা বলতে তার কোনো অসুবিধা হয় না ...। ... এই রকম একটা ভাষার 'অধিকার' নিয়েই সে স্কুলে পড়তে আসে।" (ভাষা জিজ্ঞাসা)

এই ভাষার অধিকার মানবশিশুকে বা মানুষকে কী দেয় ? ব্যাপকার্থে বলা যায় ভাষা তাকে মানবগোষ্ঠীর একজন বলে স্বীকৃতি দেয়—কারণ মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর ভাষা নেই। আর খুব সুনির্দিষ্ট অর্থে ভাষা তাকে একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে সেই ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে সেই ভাষার মাধ্যমে ভাবভালোবাসা, ধ্যানধারণা বিনিময় করে তাকে তার জীবনযাপন করার সুযোগ সুবিধে দেয়। এই সঙ্গে এও বলা যায় যে যার ভাষা ব্যবহার যত নিপুণ তার সামাজিকতাও তত নিপুণ—ফলে তার জীবনযাপনও উন্নততর। উন্নততর এই অর্থে যে সে তার চারপাশটাকে বুঝতে ও বোঝাতে পারে বেশি ভালো করে। আর যেখানেই এই ভাষার ভালো আর বাঁচার ভালোর মধ্যে একটা সরাসরি যোগাযোগ ঘটে যায় সেখানেই সচেতন মানুষের মনে ইচ্ছে জাগে ভাষাটাকে কীভাবে আরো ভালোভাবে, আরো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যায় তা খতিয়ে দেখা। আর এই ইচ্ছেটাকে ঘিরে জেগে ওঠে ভাষা সম্বন্ধীয় নানান বিশ্লেষণাত্মক মৌলিক প্রশ্ন—আমরা কী বলি, কীভাবে বলি, কেন বলি ইত্যাদি। এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতেই তৈরি হয় ভাষার ব্যাকরণ। বি + আ + ✓ কৃ + অনট্ = ব্যাকরণ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ব্যাকৃত করা অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করা—ভাষার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা।

সুতরাং বলা যায় যে সামাজিক মানুষের আত্মসচেতনার অন্যতম প্রতিফলন হল কোনো ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন।

৩.৪ ব্যাকরণের সমস্যা

আত্মসচেতনতা বা আত্মজিজ্ঞাসা থেকে ব্যাকরণের সূত্রপাত হলেও ব্যাকরণের ধারাবাহিকতার দিকে তাকালে অনেক সময়েই দেখা যায় যে ব্যাকরণ ভাষার বাস্তব অবস্থাটাকে ঠিক ঠাক ধরতে পারছে না। ব্যাকরণের নিয়মকানুনের জালে পড়ে আমাদের রোজকার চেনাপরিচিত ভাষাও যেন কেমন অচেনা জটিল ঠেকছে। অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু হলেও উত্তর খোঁজার পদ্ধতিটা খুব সহজ সরল হচ্ছে না, ফলে ব্যাকরণটাও হয়ে উঠেছে জটিল, সমস্যা সংকুল।

এর অন্তত দুটো কারণ দেখা যায় ঃ

(ক) অন্য কোনো ভাষার ব্যাকরণকে আদর্শ বা মডেল করে সেই ছকে নিজের ভাষার ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা এবং

(খ) নিজের ভাষারই কোনো প্রাচীনরূপ বা পূর্বসূরীর ব্যাকরণের আদর্শে আধুনিক ভাষার ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা।

প্রথমটির সঙ্গে তুলনীয় অন্যের জুতো বা জামায় নিজের পা বা গা গলানো আর দ্বিতীয়টি যেন নিজের শৈশবকালের জুতো বা জামায় বর্তমান কালে পা বা গা গলানো। দুক্ষেত্রেই যেমন খোলসের সঙ্গে শরীরের মাপের অসামঞ্জস্য থাকে ঠিক সেরকমই উপরোক্ত দুরকম ব্যাকরণিক চেষ্টার মধ্যেই ব্যাকরণের ছকের সঙ্গে ভাষার বাস্তব অবস্থাটা ঠিক খাপ খায় না। এবং জোর করে খাপ খাওয়াতে গেলে ব্যাকরণ অযৌক্তিক জটিলতায় ভারাক্রান্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের কথা। এই ব্যাকরণ কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছুটা ইংরেজি ব্যাকরণের আদলে লেখা। সংস্কৃত বাংলার পূর্বপুরুষ আর ইংরেজি হল অন্যভাষা যার সঙ্গে বাংলার আড়াইশো বছরের ওপর চেনাজানা। অর্থাৎ কিনা বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকে উপরোক্ত দুটি কারণই প্রভাবিত করেছে। ফলে এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বিবরণের সঙ্গে আমাদের মুখের বাংলা ভাষা বা মান্য বাংলার চেহারার মিলটা প্রায়শই অস্বচ্ছ। স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য মডেল নির্ভরতা বর্জন করে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ প্রণয়ন প্রয়োজন। প্রবাল দাশগুপ্তর ভাষায়—"প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত আর ইংরিজী ব্যাকরণের ভাণ্ডার থেকে এটা-সেটা ধার করে এনে জোড়া তালি দিয়ে তৈরি করা যে কাঠামো এখনকার বিদ্যালয় পাঠ্য 'বাঙলা ব্যাকরণ'-এ উপস্থাপিত সেই দুঃস্বপ্ন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে বাংলা ভাষার প্রকৃত জ্ঞানের জগতে।" (কথার ক্রিয়াকর্ম)

ব্যাকরণের এই সমস্যা অবশ্য কোনো আধুনিক সমস্যা নয়, বা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিকও নয়। এই সমস্যা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু ভাষার ব্যাকরণেই দেখা যায়। এই ধরণের সমস্যাসংকুল ব্যাকরণকে প্রথাগত ব্যাকরণ এবং সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার সচেতন চেষ্টায় প্রণীত ব্যাকরণকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণ আখ্যা দিয়ে আমরা এই দুই ধারার আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমে পাশ্চাত্যে লাতিন ব্যাকরণের প্রভাব ও তারপর প্রাচ্যে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। ব্যাকরণের এই প্রথাগত ধারার পর আলোচনা করব আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের।

৩.৫ পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে দু-জায়গাতেই ভাষা সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তার সূত্রপাত প্রথমে ধর্মীয় ও পরে দার্শনিক চিন্তার হাত ধরে। তারও পরে ক্রমশ তা স্বতন্ত্র ভাষাচিন্তার রূপ নেয় ও স্বতন্ত্র ব্যাকরণের জন্ম দেয়।

ইউরোপে প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনার গৌরব গ্রিকদের। প্রথম তিন গ্রিক বৈয়াকরণ হলেন দিওনুসিওস্ থ্রাক্স (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), আপোলোনিওস্ দুস্কোলোস্ (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) ও তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস্।

দিওনুসিওস্ থ্রাক্স প্রধানত রূপতত্ত্বের মূল কাঠামোর বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। তিনি বাক্যের আট রকম পদবিভাগ করেন—noun, pronoun, article, verb adverb, participle, preposition ও conjunction ।

এর পরবর্তী সময়ে আপোলোনিওস্ দুস্কোলোস্ এর সঙ্গে যোগ করেন বাক্যতত্ত্বের বিধিবদ্ধ আলোচনা। তারপর হেরোদিয়ানুস্ গ্রিক ভাষার স্বরাঘাত-বিধি ও বিরাম-বিধি নিয়ে আলোচনা করেন।

এই তিন বৈয়াকরণের হাতে গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের ছাঁদই ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে আদর্শ বা মডেল বলে গণ্য হয়। লাতিন ভাষার বৈয়াকণিকরা এই ছাঁদ অনুসরণ করে লাতিন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং তাঁদের অনুকরণে এই ছাঁদ বা কাঠামো দীর্ঘকাল পর্যন্ত আধুনিক আর্যভাষাসমূহের ব্যাকরণ রচনায়ও অনুসৃত হয়েছে।

গ্রিক ব্যাকরণের তিনটি সীমাবদ্ধতা ছিল ঃ (ক) এই ব্যাকরণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেশি।

(খ) গ্রিকরা ভাবত তাদের ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—অর্থাৎ তা সর্বজনীন।

(গ) এই ব্যাকরণের আলোচ্য ভাষা কথ্য ভাষা নয়, সাহিত্যের ভাষা।

গ্রিক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ানুস্-এর লাতিন ব্যাকরণে (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। তিনি ক্লাসিকাল লাতিন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত বাক্যের আট প্রকার পদ হল—noun, pronoun, verb, participle, adverb, preposition ও conjunction ।

মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল ক্লাসিকাল লাতিনের চর্চা ও তার সহায়ক প্রিস্কিয়ানুস্-এর ব্যাকরণ অনুসরণ। এমনকি পরবর্তী যুগের লাতিন ব্যাকরণ সমূহও মূলত এই ব্যাকরণেরই অনুসারী। শুধু তাই নয়, এই লাতিন ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল যে লাতিন ভাষার ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, এই ধারণার জন্ম গ্রিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা থেকেই। এর ফলে কোনো কোনো লাতিন ব্যাকরণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে ওই লাতিন ব্যাকরণটি প্রাচীন ইংরেজি ভাষারও ব্যাকরণের ভূমিকারূপে গৃহীত হতে পারে।

শুধু ইংরেজি নয়, পরবর্তীকালে ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ইত্যাদি আধুনিক ইউরোপীয় আর্যভাষার ব্যাকরণও রচিত হয় মূলত প্রিস্কিয়ানুস্-এর লাতিন ব্যাকরণের কাঠামো অনুসরণ করে, এমনকি ইংরেজি, জার্মান, আইরিশ প্রভৃতি যে সব ভাষা লাতিন ভাষা থেকে আসেনি তাদের ব্যাকরণেও লাতিনের প্রভাব খুব বেশি। এ সবেরই কারণ মধ্যযুগের সেই বদ্ধমূল ধারণা—লাতিন ব্যাকরণের কাঠামোই সব ভাষার সাধারণ ব্যাকরণের আদর্শ কাঠামো।

এর ফলে যা হল তা রামেশ্বর শ এর বর্ণনায়—"এই ধারণার ফলে ক্রমশ এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, যা এই ব্যাকরণের নিয়ম মানে না সেই প্রয়োগ অশুদ্ধ। ফলে কোনটি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ, এই বিচারই ব্যাকরণে স্থান পেতে থাকে এবং মনগড়া শুদ্ধ প্রয়েগের নির্দেশ দিতে থাকায় ব্যাকরণ ক্রমশ নির্দেশমূলক ব্যাকরণ হয়ে ওঠে।.....সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, পাশ্চাত্য দেশে ব্যাকরণের ধারাটি ছিল প্রথম দার্শনিক, পরে হয়ে উঠল নির্দেশমূলক। প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ মূলত মধ্যযুগীয় লাতিন

ব্যাকরণের আদর্শে রচিত নির্দেশমূলক ব্যাকরণই ছিল, একালে ইংরেজি ভাষার বহুপ্রচলিত নেসফিল্ড ব্যাকরণ তার প্রধান নিদর্শন।"

ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণের আটটি পদ Part of speech বা এর অস্তিত্ব—nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions ও interjections।

এই আটটি শ্রেণির চরিত্র বড় বহুমুখী, ফলে তাদের বৈধতার মানদণ্ডও সমান বহুমুখী। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে এদের বৈধতা বা সিদ্ধতার বিচার করা যায় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল এই আটটি শ্রেণির সংজ্ঞা কোথাও পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় (ovelapping), কোথাও, বা পরস্পর বিরোধী (conflicting) আবার কোথাও বা যথেষ্ট অস্পষ্ট (vague)। অর্থাৎ যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক।

এই অবৈজ্ঞানিকতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রথাগতভাবে Parts of speech-এর শ্রেণিকরণ অর্থভিত্তিক। যেমন, noun হল ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ, কার্য, সম্পর্ক ইত্যাদির নাম adjectives গুণ নির্দেশ করে ; Verb কাজ, অবস্থা, অনুভূতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে। এবার কয়েকটি উদাহরণের দিকে তাকানো যাক।

১) The tall boy is coming.

২) Tallness is desired.

৩) I always walk fast.

৪) I am going for a walk.

১ম বাক্যে tall (লম্বা) হল, অর্থাৎ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুণনির্দেশক শব্দ, আর ২য় বাক্যে tallness (লম্বাত্ব/দীর্ঘতা) হল, অর্থাৎ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুণনাম কিন্তু এখানে মুশকিলটা এই যে tall কেন গুণনির্দেশক এবং কেনই বা tallness গুণনাম তার হদিশ কিন্তু সংজ্ঞায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তার হদিশ পাওয়া যায় শব্দ দুটির চেহারায় কিছুটা এবং বাক্যে তাদের ব্যবহারে বাকিটা, এসবের নির্দেশ কিন্তু সংজ্ঞায় দেওয়া নেই। সংজ্ঞা অর্থনির্ভর এবং অর্থের দিক দিয়ে শব্দদুটির মধ্যে প্রভূত মিল। অর্থাৎ সংজ্ঞা শ্রেণিকরণের মূলসূত্রটিকে ধরতে পারেনি।

৩য় বাক্যে walk (হাঁটা) হল, সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ ও ৪র্থ বাক্যে (walk) (পায়চারি হল) noun, সংজ্ঞা অনুযায়ী কার্য-নাম। এই উদাহরণ দুটিতে সংজ্ঞার মুশকিলটা আরও ভালোভাবে পরিস্ফুট। এখানে বাক্য দুটির উপস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া দুটি walk এর কোনটি verb আর কোনটি noun তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সংজ্ঞা এখানে শব্দের শ্রেণি চেনাতে পুরোপুরি ব্যর্থ। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রথাগত ব্যাকরণের parts-of-speech-এর সংজ্ঞার বৈধতার প্রশ্ন ওঠেই। এছাড়াও সংজ্ঞায় ইত্যাদি প্রভৃতি (etc)-র অস্তিত্ব, লজিকের নিয়ম অনুযায়ী, সংজ্ঞার গুরুত্ব খর্ব করে।

এতো গেল প্রথাগত ব্যাকরণের একধরনের সীমাবদ্ধতার কথা। এছাড়াও নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এই সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে অর্থকে নয়, শব্দের গঠন ও বাক্যে তার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে parts-of-speech এর সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করে। এর একটি অতি সরলীকৃত উদাহরণ হল—ইংরেজিতে adjective বলে গণ্য হবে সেই শ্রেণিভুক্ত শব্দরা যারা প্রথমত er ও est প্রত্যয় গ্রহণ করে, যেমন—

tall	rich	strong	weak
taller	richer	stronger	weaker
tallest	richest	strongest	weakest ইত্যাদি

দ্বিতীয়ত যারা বাক্যে adjective এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহৃত হবে, যেমন The tall man is coming.

এই নিয়ম অনুযায়ী handsome শব্দটি ১ম শর্ত পূরণ না করলেও (ইংরেজিতে handsomers বা শব্দ handsomest হয় না) ২য় শর্ত পূরণ করে। কারণ ইংরেজিতে বলা যায়।

The handsome man is coming.

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত ইংরেজি ব্যাকরণ আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। সমস্যা ও সমাধান বোঝাবার জন্য পায়ে পায়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর জটিলতায় না জড়িয়ে প্রসঙ্গান্তর থেকে ফিরে যাই ল্যাতিন অধ্যুষিত পাশ্চাত্য প্রথাগত ব্যাকরণে এবং এই আলোচনার ইতি টানি রামেশ্বর শ-এর অনুসরণে।

"মধ্যযুগের নির্দেশমূলক ব্যাকরণের অবদান বিচার করতে গেলে মনে হয়, এই বৈয়াকরণরা সমাজে প্রচলিত ভাষার বাস্তবরূপ না দেখে ঐতিহ্যগত বা মনগড়া তত্ত্বের মানদণ্ডে ভাষার তথাকথিত শুদ্ধরূপ ধরে রাখার জন্য নির্দেশমূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তাতে ভাষার জীবন্তরূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। এতে লাতিন ভাষা ক্রমশ ব্যাকরণের জালে বাঁধা পড়ে কৃত্রিম হয়ে মৃত ভাষায় পরিণত হয়ে যায়, অন্যদিকে লোকমুখে ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ব্যাকরণের শাসন উপেক্ষা করে চলতেই থাকে। এর ফলে জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে এবং লাতিন ব্যাকরণ কৃত্রিম ভাষার ব্যাকরণে পর্যবসিত হয়।"

এই হল পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ধারণা।

৩.৬ প্রাচ্যে ব্যাকরণ

প্রাচ্য, বিশেষত ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে, লাতিন ব্যাকরণের স্থান গ্রহণ করে সংস্কৃত ব্যাকরণ। বস্তুত কালের বিচারে লাতিন ব্যাকরণের তুলনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন।

যেহেতু বর্তমান পাঠ্যক্রমের যাবতীয় আলোচনাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক তাই আমরা প্রাচ্য ব্যাকরণের আলোচনা শুরু করব বাংলার পূর্বসূরী ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণের প্রেক্ষাপটে এবং পৌঁছব বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায়। আলোচনা এই পরিসরেই সীমিত থাকবে। আর এই পরিসরের একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়ার জন্য তো আমরা ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য ব্যাকরণ ধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে বহু শ্রুত, বহু পঠিত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বহুল প্রচারিত হল পাণিনির অষ্টাধ্যয়ী ব্যাকরণ। পাণিনি ও তাঁর অষ্টাধ্যয়ীর কালনির্ণয় আজও অমীমাংসিত। বিভিন্ন মতের অন্যতম হল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

পাণিনির ব্যাকরণ গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়—(ক) ভারতীয় ব্যাকরণের ঐতিহ্যের ধারা পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন, এবং (খ) ভারতীয় ব্যাকরণের ঐতিহ্য পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের তুলনায় বহু প্রাচীন।

ব্যাকরণের ভারতীয় ঐতিহ্যের শুরু যেমন পাণিনির আগে তেমনই পাণিনির পরবর্তী সময়েও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত। এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ব্যাকরণ ধারার কয়েকজন বৈয়াকরণের নাম—পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, বামন, কৈয্যট, ভট্টোজি দীক্ষিত, হেমচন্দ্র, শর্ববর্মা, অনুভূতি স্বরূপাচার্য বোপদেব, ক্রমদীশ্বর, রূপগোস্বামী, কোন্ডভট্ট, জগদীশ, তর্কালংকার, গঙ্গাধর ইত্যাদি।

ভারতবর্ষব্যাপী সংস্কৃত ব্যাকরণের এই সমৃদ্ধে ঐতিহ্য যে পরবর্তীকালে পালি প্রাকৃত ব্যাকরণ সমূহকে এবং আরও পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ব্যাকরণকে প্রভাবিত করবে তা বলাই বাহুল্য।

৩.৬.১ বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আমরা বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকে বেছে নিচ্ছি কারণ এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত এবং এই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণগুলিই আমাদের সামনে বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যাগুলো তুলে ধরে।

বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ বিষয়ে উল্লেখ্য যে এই ব্যাকরণগুলির ওপর দুটি প্রধান ব্যাকরণিক প্রভাব দেখা যায়। (ক) সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব—যার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। (খ) ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব—যার কারণ এদেশে ইংরেজের দীর্ঘকালীন উপনিবেশ এবং তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার চর্চা।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আমাদের ৩ অংশে উল্লিখিত ভাষার ব্যাকরণে জটিলতা আমদানির দুটি কারণই বাংলা ব্যাকরণে উপস্থিত। প্রথম কারণ অনুযায়ী অন্য ভাষা ইংরেজির ব্যাকরণকে মডেল করে বাংলা ব্যাকরণের কোনো কোনো অংশ প্রণীত, আর দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী পূর্বসূরী সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের আদর্শে বাংলা ব্যাকরণের কোনো কোনো অংশ প্রণীত।

এখন আমরা বাংলা ব্যাকরণের এই দ্বিবিধ কারণ জনিত দ্বিবিধ সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

৩.৬.২ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব

এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ বাংলা ব্যাকরণের দু-একটি অংশের উল্লেখ করব।

প্রথমত বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবেই আসে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিশ্লেষণ। প্রতিটি তৎসম শব্দের, তা বাংলায় যতই কম ব্যবহার হোক না কেন, সংস্কৃত কৃৎ তদ্ধিত প্রত্যয়ের রীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন—

নয়ন = ✓ নী + ল্যুট্ / অনট্	মৃত = ✓ মৃ + ক্ত
ভীষণ = ✓ ভীষ্ + ল্যুট্ / অনট্	নত = ✓ নস্ + ক্ত
বিধান = ✓ বি- ধান + ল্যুট্ / অনট্	উক্ত = ✓ বচ্ + ক্ত
	ছিন্ন = ✓ ছিদ্ + ক্ত
	রূঢ় = ✓ রুহ্ + ক্ত
কৃতি = ✓ কৃ + ক্তি	জিজ্ঞাসা = ✓ জ্ঞা + সন্ + টাপ্
শান্তি = ✓ শম্ + ক্তি	সহিষ্ণু = ✓ সহ + ইষ্ণু
সুপ্তি = ✓ স্বপ্ + ক্তি	জিষ্ণু = ✓ জি + ষ্ণুক
গ্লানি = ✓ গ্লা + ক্তি	ইত্যাদি।

শব্দ বিশ্লেষণের এই রীতি কিন্তু সাধারণ বাংলাভাষীর কাছে যথেষ্ট অস্বচ্ছ। বাংলা ব্যাকরণে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণহীন অবস্থায় এই সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির সংযুক্তি মনে কোনো সম্পূর্ণ ধারণা জন্ম দেয় না। এবং এদের

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও বাংলা ব্যাকরণের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অর্থাৎ সাধারণ বাংলা ব্যাকরণে এই সংযুক্তির কোনো সার্থকতা নেই। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে ওপরের শব্দগুলো এবং এরকম অনেক তৎসম শব্দই সম্পূর্ণ গঠিত শব্দরূপেরই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। তাছাড়াও যে ধাতুগলি থেকে শব্দগুলি তৈরি হয়েছে (যেমন—নী, ধা, সৃ, বচ্, জ্ঞা, কৃ, গ্লা ইত্যাদি) সেই ধাতুগুলি বাংলা নয়, বাংলায় তাদের অস্তিত্ব নেই। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, যেমন শব্দের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ জানার এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখাই বিধেয়। বাংলা ব্যাকরণকে অযথা জটিলতা ভারাক্রান্ত করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃতের অনুসরণে কারকের সংখ্যা দেখানো হয় ছয়-কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পবিত্র সরকার পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই। অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের সংযুক্তি ব্যাকরণকে জটিল ও অযৌক্তিক করে তোলে মাত্র।

তৃতীয়ত, বাংলা লেখার বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা ও ক্রম এবং বানান পদ্ধতি সংস্কৃতানুগ হওয়ায় বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনি বর্ণনা ও বানান সংক্রান্ত আলোচনা-নত্ববিধি-ষত্ববিধি ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে। বাংলা ধ্বনির আলোচনায় ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকে না, যেমন বাংলা স্বরধ্বনি সাতটি, কিন্তু স্বরবর্ণ এগারোটা, নাসিক্য ধ্বনি তিনটি, কিন্তু নাসিক বর্ণ পাঁচটা। তারপর বানানের ক্ষেত্রে আছে ণত্বষত্বের বিধান যা শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সব সংযুক্তি বাংলা ব্যাকরণকে জটিল ও অবৈজ্ঞানিক করে তোলে।

এছাড়াও বাংলা ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, বিশেষণের তারতম্যের (তর-তম), লিঙ্গ, ক্রিয়া ইত্যাদি যেদিকেই তাকাই না কেন অজস্র ছড়াছড়ি দেখা যায়, এই সব নিয়ম বাংলার গুরুগম্ভীর সাধু লেখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিয়দংশে প্রযোজ্য, কিন্তু রোজের মুখের বাংলা ও চলিত লেখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নেহাতই বাহুল্য।

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভাবিত বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণ বাংলা ভাষার নিজস্ব চালচলন থেকে অনেকটাই দূরবর্তী, অর্থাৎ কিনা তা বাংলা ভাষার নিজস্ব ঠিকঠাক ব্যাকরণ নয়।

৩.৬.৩ ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে কারণ বাংলা সংস্কৃতের উত্তরসূরী। আর ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবের কারণ হল অনেকদিন ইংরেজির পাশাপাশি বসবাস, ফলে ইংরেজি থেকে বহু উপকরণ গ্রহণ। উপরন্তু প্রথম যুগের বাংলা ব্যাকরণগুলো বিদেশিদের মূলত ইংরেজদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে, তথোপযুক্ত রূপে গৃহীত উপকরণের মধ্যে একটি হল বাংলা লেখার নিয়মকানুন, যথা—অনুচ্ছেদ, পঙ্‌ক্তিভাগ, কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, হাইফেন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বিস্ময়সূচক ও প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার, বাংলায় দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো ছেদ চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ইংরেজির উপকরণ গ্রহণ করার ফলে বাংলা লেখার সৌষ্ঠভ বেড়েছে ও ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু যেখানে বাংলার নিজস্ব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে অযথা উপকরণ আমদানি করে সেই ছাঁচে বাংলাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই এসেছে ব্যাকরণের জটিলতা। এইরকম একটি ক্ষেত্র হল বাংলা বাচ্য। বাংলার বাচ্য পরিবর্তন পদ্ধতি সংস্কৃত বা ইংরেজির মতো নয়। অনেক সময়েই ইংরেজির কর্তৃবাচ্যের থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম বাংলায় প্রয়োগ করে বাংলার বাচ্য বিশ্লেষণ করা হয়। আর তার ফলে তৈরি হয় নানা ধরনের কৃত্রিম উদাহরণ। যেমন—

তৃষ্ণা ফুলের মালা গেঁথেছে → তৃষ্ণার দ্বারা ফুলের মালা গাঁথা হয়েছে।

কে বাবলাকে দোকানে পাঠিয়েছে → বাবলা কার দ্বারা দোকানে প্রেরিত হয়েছে?

রহিমা কি সাবিনাকে চিঠি দিয়েছে? → সাবিনা কি রহিমা কর্তৃক চিঠিটা প্রদত্ত হয়েছে?

কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত ডানদিকের বাক্যগুলো বাংলার স্বাভাবিক নিজস্ব বাক্য নয়, তাই এগুলো শুনতেও অত্যন্ত কৃত্রিম। মূলত ইংরেজি বাচ্য পরিবর্তনের ছাঁচে ফেলে এই বাচ্য পরিবর্তন করা হয়েছে বলেই এই বিপর্যয়।

শুধুমাত্র বাচ্যই নয় বাক্য বিশ্লেষণের অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়মকানুন দ্বারা প্রভাবিত।

এর কারণ হল সংস্কৃত ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের পরম্পরা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। বাক্য বিশ্লেষণের রীতিপদ্ধতি ইংরেজি ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে বাংলা ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের ধারণা যেমন এসেছে ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে ঠিক তেমনই এই ধারণার হাত ধরে বাংলা ব্যাকরণে ঢুকে পড়েছে ইংরেজি বাক্য বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মকানুন।

৩.৭ প্রথাগত থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা আলোচনার পর আমরা আলোচনা করব প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিবর্তনের চিত্রটা। পূর্ববর্তী এককসমূহে ইতিমধ্যেই বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে চর্চার ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর। এখানে তাই আমরা দু-এক কথায় তারই পুনরাবৃত্তি করে আলোচনা করব গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

আগেই বলেছি যে প্রথাগত ব্যাকরণ চর্চার ধারা ক্রমশ হয়ে উঠল নির্দেশমূলক ব্যাকরণ চর্চা। এর কারণ ভাষার তথাকথিত শুদ্ধ রূপ ধরে রাখার চেষ্টা। আর এর ফলাফল জীবন্ত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের দুস্তর ব্যবধানের সূত্রপাত।

নির্দেশমূলক ব্যাকরণের এই আধিপত্য দেখা যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ধারাতেই এবং আধিপত্য প্রধানত গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচীন ভাষারূপকে কেন্দ্র করে। ইয়োরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের পর ব্যাকরণের এই নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র প্রাচীন ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা আরোপিত হয়েছে জীবন্ত মাতৃভাষার ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রেও। আজও বাংলা বা ইংরেজি ভাষার অনেক স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণেই এই নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া বর্তমান।

ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ও তার চর্চা হয় ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারাই। এই নতুন ধারা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যে নবজাগরণের যুগে বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অভিযান ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার মিল অমিল যতই স্পষ্ট হতে থাকে ততই ক্রমে ক্রমে ভাষাতত্ত্ব বিদ্‌দের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁর বক্তৃতায় গ্রিক, লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তান প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি প্রথম ধরিয়ে দেন এবং এই সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই ভাষাগুলির অভিন্ন বংশগত উৎসের ইঙ্গিত দেন।

পরবর্তীকালে এই সাদৃশ্যসূত্রের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

পরবর্তীকালে এরই পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটি ভাষার কালক্রমিক বিবর্তনের ধারার চর্চা বা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সব সময়েই একটি ভাষা বা একটি সময়কে অতিক্রম করে ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করেছে। ফলে সর্বদাই একাধিক সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব এই ধরণের ব্যাকরণ চর্চাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই এই ধারাকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বও আখ্যা দেওয়া হয়।

এই সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব-যুগের পরবর্তীকালে এসেছে গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ব্যাকরণ চর্চার ধারা। এই ধারায় কোনো একটি নির্দিষ্ট কালের কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষার বিভিন্ন গঠনগত উপাদানের বর্ণনা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের এই বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞান ; বিভিন্ন ভাষার অথবা একই ভাষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তুলনা করার মতো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও প্রথাগত ও নির্দেশমূলক ব্যাকরণ ধারার পরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ভাষাতত্ত্বের হাত ধরে, তবুও পরবর্তী এককগুলিতে আমরা বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা আঁকব বর্ণনামূলক ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কারণ আমাদের পাঠ্যসূচিতে ব্যাকরণের সাধারণ উদ্দেশ্যই, অর্থাৎ বাংলা ভাষার গঠন বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য। কোনো তুলনামূলক বিশেষ উদ্দেশ্য এ পাঠ্যসূচির লক্ষ্য নয়।

অর্থাৎ আমরা আমাদের পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্যর সঙ্গে সংগতি রেখে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে বোঝাব মূলত ভাষার গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ব্যাকরণকেই।

৩.৮ গঠনমূলক বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুরের হাত ধরে এই ধারার প্রতিষ্ঠালাভ। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান একছত্রাধিপত্য লাভ করে ; এবং এর চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেরিকা।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা।

রূপ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ—কীভাবে বিভিন্ন ছোটো ছোটো এককের সমন্বয়ে বড়ো বড়ো এককগুলি গঠিত হচ্ছে বা বড়ো এককগুলিতে ক্ষুদ্রতর এককে বিভক্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন মাপের এককগুলি চিহ্নিত করা ও তাদের শ্রেণিবদ্ধ করা ইত্যাদিও হল বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি। মূলত ভাষার গঠন বিশ্লেষণ করে বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্য নাম গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান, আর ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ করে বলে একে এককালিক ভাষাবিজ্ঞানও বলা হয়।

বস্তুত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান ও এককালিক ভাষাবিজ্ঞান এই তিনের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছেই। কিন্তু ব্যাপকার্থে এই তিনটিকে একই শ্রেণিভুক্ত বা সমার্থক মনে করা যায়। আমাদের এই পাঠ্যসূচিতে আমরা এই ব্যাপকার্থ অনুযায়ী এই তিনটিকে একই ধারার তিনটি ভিন্ন নাম হিসেবে ধরে নিচ্ছি।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে বিশ্লেষণ করে—ধ্বনি, রূপ ও বাক। এই তিন স্তর অনুসারে, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি আলোচ্য বিভাগের নাম—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব।

রামেশ্বর শ-র ভাষায় "ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রথমেই দেখি যে, আমাদের ভাষা কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। আমাদের বাক্‌প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম যে এক একটি নিটোল অর্থপূর্ণ বৃহত্তম একক পাই তা হল বাক্য। এই বাক্যকে আবার ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি শব্দ পাই। আবার শব্দকেও যদি তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লিষ্ট করি তাহলে দেখব যে এক একটি শব্দ কতকগুলি ধ্বনি নিয়ে গঠিত। ধ্বনিকে আর আমরা তার চেয়ে কোনো ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করতে পারি না। আমরা ধরে নিতে পারি যে, ভাষা-বিশ্লেষণের শেষ ধাপ হল ধ্বনি, এই ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি যোগ করে আমরা ভাষার যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক পাই তাকে সাধারণ বলি শব্দ, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে শব্দ না বলে রূপিম বা মূলরূপই বলা উচিত ঃ কারণ 'মূলরূপ' ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। শব্দ অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি বটে, কিন্তু তা সব সময় অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়, কিন্তু মূলরূপ হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি। ধ্বনি পরের ধাপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরটি হল 'রূপিম' বা 'মূলরূপে'র স্তর। এর পরের স্তরে আমরা দেখি, কতকগুলি মূলরূপ এবং শব্দ মিলে এক একটি বাক্য রচিত হয়। বাক্য হচ্ছে ভাষার তৃতীয় স্তর।"

তিনটি স্তরের পর আলোচনা করব তিনটি আলোচ্য বিভাগের—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্বের।

৩.৮.১ ধ্বনিতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা আবার দুটি উপরিভাগে বিন্যস্ত—ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার বা ধ্বনিতত্ত্ব।

ধ্বনিবিজ্ঞান - কোনো ভাষার প্রতিটি ধ্বনিই প্রথমে বক্তা তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারণ করে, তারপর তা ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে বাতাসে ভাসতে ভাসতে শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছায় এবং অবশেষে তা শ্রোতার কানের পর্দার থেকে স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে স্নায়ুতরঙ্গের রূপে তার মস্তিষ্কে পৌঁছায়। বাগ্‌ধ্বনির এই তিনটি অবস্থা অনুসারে, ধ্বনিবিজ্ঞান তার তিনটি উপশাখায় ধ্বনি আলোচনা করে। এই তিনটি হল—উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতরঙ্গমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান ও শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

ধ্বনিবিচার বা ধ্বনিতত্ত্ব - এই শাখা কোনো ভাষায় মোট কটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প আছে তা নির্ণয় করে। এই ধ্বনিকল্পগুলির অবস্থান বা প্রতিবেশ বিশেষে কী কী উচ্চারণে - বৈচিত্র্য বা ধ্বনিবিকল্প হয় তা নির্ণয় করে ও তাদের শর্তাধীনতা বিচার করে। ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকল্পের ভূমিকা ও অন্যান্য ধ্বনিকল্পের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারণ করে ধ্বনিতত্ত্ব। অর্থাৎ একটি ধ্বনিকল্পের সঙ্গে অপর ধ্বনিকল্প (সমূহের) সংযোগের ফলে কীভাবে বৃহত্তর একক তৈরি হয় তার নিয়ম প্রণয়ন করে ধ্বনিকল্প।

এইসব আলোচনা পরবর্তী এককগুলিতে বিস্তারিতভাবে আসবে। এখানে শুধু একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। ধ্বনিবিজ্ঞান উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি বিচার করে সাব্যস্ত করে যে বাংলা বাগ্‌ধ্বনি (বর্ণ নয়) শ একটি অঘোষ উষ্ম-তালব্য ধ্বনি। এবার ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা উচ্চারণে শ এর বিভিন্ন অবস্থান বিচার করে সিদ্ধান্ত আসে

যে বাংলায় শ একটি মূলধ্বনি বা ধ্বনিকল্প, প্রতিবেশ বিশেষে শ এর অপর একটি উচ্চারণ বৈচিত্র্য বা ধ্বনি বিকল্প আছে যা হল স্-উচ্চারণে শ্ এর অব্যবহিত পরে র্ বা ল্ এলে শ্ পরিণত হয় স্ এ যেমন শ্রী বা শ্লীল-এর (বানান যাই হোক) উচ্চারণ স্রী বা স্লীল।

৩.৮.২ রূপতত্ত্ব

একক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের সংযোগে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক তৈরি হয় তাকে রূপমূল বা রূপকল্প বলা হয়।

ভাষায় কত ধরনের রূপকল্প আছে, বিভিন্ন প্রতিবেশে তাদের কী কী রূপবিকল্প আছে, বিভিন্ন রূপকল্প জুড়ে জুড়ে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে কী কী শব্দ বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয়ে কি রকম শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ তৈরি হয় ইত্যাদি আলোচনা করে রূপতত্ত্ব। যেমন-বাংলায় সম্বন্ধ পদসূচক রূপকল্প হল-র, এর দুটি বিকল্প -র ও -এর। নদী এবং ঘর এই দুটি রূপকল্পের সঙ্গে সম্বন্ধ-রূপকল্প যোগ করে আমরা নদীর এবং ঘরের - এই শব্দরূপ পাই ইত্যাদি।

৩.৮.৩ বাক্যতত্ত্ব

এক বা একাধিক রূপকল্প ও শব্দকে জুড়ে মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় বাক্য। বাক্যের বিভিন্ন উপাদান পর পর সাজানোর বা জোড়ার নিয়ম নির্ধারণ করে বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্ব বাক্যের বিভিন্ন উপাদানকে অন্বিত করার নীতি নির্ণয় করে বলে এর অপর নাম অন্বয় তত্ত্ব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চলিত বাংলায় নঞর্থক বাক্য বা বাক্যাংশে নঞর্থক শব্দটি বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পর, কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে। যেমন - ঝিনুক না ডাকলে নান্দিক আসবে না।

৩.৮.৪ অন্যান্য

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনগত এই তিনটি স্তর। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষা সম্বন্ধীয় আরো কিছু কিছু জরুরি আলোচনা ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে আরও প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হল উপভাষাবিজ্ঞান, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা পরিকল্পনা, শৈলীবিজ্ঞান ইত্যাদি।

উপভাষা বিজ্ঞানে কোনো ভাষার ভৌগোলিক অঞ্চল বিচারে যে বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয় তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন বাংলার উপভাষা হল রাঢ়ি বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডি।

সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে সমাজের বিভিন্ন স্তর ভেদে ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য তাই আলোচনা করা হয়। যেমন শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত আর রোয়াকে বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার দুটি রূপ।

ভাষাপরিকল্পনা ভাষাবিজ্ঞানের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে একটি দেশের জাতীয় ভাষা কী হবে, শিক্ষার মাধ্যম কোন্ ভাষা হবে, কোন্ ভাষার স্বীকৃতি প্রয়োজন, কোন ভাষার বিলুপ্ত প্রায় ভাষার সংরক্ষণের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষা দেশে ভাষাপরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

শৈলীবিজ্ঞান ভাষার, বিশেষত সাহিত্যের ভাষার শৈলী বিশ্লেষণ করে।

পরবর্তী এককসমূহে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের এই সমস্ত শাখা উপশাখার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.৮.৫ সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক সংযোজন হল সংবর্তনী তত্ত্ব—যার সূত্রপাত করেছেন নোয়াম চমস্কি।

গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার মনোগত দিকটি, তার ভাবগত অর্থগত দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভাষার বাহ্যগঠন তার অবয়বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

চমস্কি ভাষার সৃজনশীলতার ওপর আলোকপাত করে ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষ তার শৈশবেই তার মাতৃভাষা শুনে শুনে সেই মাতৃভাষার ব্যাকরণের মূল নিয়মগুলি তার সহজ বোধের সাহায্যে আপনা থেকেই শিখে নেয়। তারপরে ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে উপাদান চয়ন করে, ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে, সেই শব্দসম্ভারকে নিত্য নতুন রূপে সাজিয়ে অফুরন্ত নতুন বাক্য সৃষ্টি বা সঞ্জনন করে চলে। এই প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ হল সংবর্তন, যা এক বাক্যকে অন্য বাক্যে রূপান্তরিত করে। এই ব্যাকরণ তত্ত্বের অপর নাম রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ। চমস্কির প্রথম গ্রন্থ 'সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচার' ১৯৫৭ তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই নতুন তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা ভাষাবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তোলে ও এক নতুন যুগের সূচনা করে।

চমস্কি তাঁর তত্ত্বে ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভাষার মনোগত দিকটিকে গুরুত্ব দিলেন। তাঁর তত্ত্ব তাই মনস্তত্ত্বপ্রধান তত্ত্ব। অধুনা এই তত্ত্ব বহু চর্চিত, বহু বিতর্কিত ও বহু সম্ভাবনাময় শাখায় বিভক্ত। আর যেহেতু এই তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রধান, এবং মনোজগতের অতি সামান্যই মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন, তাই এই তত্ত্বের প্রতিটি পদক্ষেপেই তর্কের অবকাশ রাখে। সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ প্রণয়ন করা অসম্ভব। এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন টুকরো টুকরো অংশের উপর এই তত্ত্বের প্রয়োগনিরীক্ষা চলছে। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কি তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করব না, বরং বর্ণনামূলক গঠনমূলক তত্ত্বেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

৩.৯ বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা সাহিত্য হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন হলেও বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশিদের দ্বারা। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা ব্যাকরণের প্রাচীন বইটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এটি বিদেশি বৈয়াকরণদের হাতে লেখা। ১৭৪৩ থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য এবং বহু ধারার বাংলা ব্যাকরণ প্রণীত হয়েছে। এই অংশে আমরা বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন ধারা ও তার ওপর প্রাচ্যপাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যাকরণতত্ত্বের প্রতিফলনের খুব সংক্ষিপ্ত এক পরিচয় দেব।

বাংলা ব্যাকরণের সূত্রপাতের যুগে ব্যাকরণ ও শব্দকোশ প্রায়শই হাত ধরাধরি করে চলেছে। যেমন ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, মনোএল আস্‌সুম্পসাঁউ প্রণীত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ 'বাঙ্গালা ও পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোশ দুইভাগে বিভক্ত' (Vocaburio em idioma Bengalla e protuguez dividido em duas partes)। এর কারণ তখন ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশীদের, বিশেষত ইংরেজদের বাংলা শেখানো। তাই বাংলা ভাষার নিয়মকানুনের সঙ্গে শব্দসম্ভার শেখানোও ছিল প্রয়োজনীয়।

এই প্রথম যুগের বাংলা ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্য হল—

১) ইংরেজদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত।

২) বিদেশি ও দেশি উভয় শ্রেণির লেখক-ই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

৩) প্রায়শই ইংরেজিতে লেখা।

৪) উপরোক্ত তিন কারণে এগুলি ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ প্রভাবিত।

৫) কথ্য বাংলার ব্যাকরণ।

এর পরবর্তীকালে বিশেষত বাংলা ভাষার সাধু রীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত রীতিতে সাজানো হল। বর্তমানের স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে আজও সেই রীতির প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়াও বাংলা ব্যাকরণের ধারায় বিভিন্ন সময়ে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও সঞ্জননী তত্ত্বের প্রভাবও দেখা যায়। যেহেতু এই সব ব্যাকরণতত্ত্বের চর্চার সূত্রপাত পাশ্চাত্যে তাই এই সব ধারার বাংলা ব্যাকরণেও পাশ্চাত্য প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিকগণ পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাগ্রহণ করে সেই নতুন ব্যাকরণ তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন বাংলা ভাষার ওপর। আরো লক্ষণীয় যে এইসব নতুন ধারার ব্যাকরণচর্চা কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে হয়ে চলেছে। হয়তো প্রাচীন প্রথাগত ব্যাকরণের ওপর বর্ণনামূলক ব্যাকরণের চিন্তাধারার অনেকটা প্রভাব পড়েছে, ফলে ব্যাকরণের চেহারা অনেকটাই আধুনিকতা পেয়েছে। কিন্তু এমন বলা যায় না যে প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এর একটা প্রধান কারণ হল বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণ ক্ষেত্রের সিংহভাগ দখল করে স্কুলপাঠ্য দ্বারা। এই সব পাঠক্রম ব্যাকরণের জগতের নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, বরং প্রথাগত ভাবনাচিন্তার ধারাকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রভাব আজও অনস্বীকার্য।

অপর একটি কারণ হল অন্য ধারার ব্যাকরণের সংখ্যা স্বল্পতা। ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক ধারার বাংলা ভাষার দু-একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ আছে। সঞ্জননী ধারায় বাংলার আজ অবাধ কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই। এই হাতে গোনা কটি ব্যাকরণের পক্ষে আজ অবাধ বহুচর্চিত প্রথাগত ধারাকে নাড়ানো বা সরানো সম্ভব নয়।

এখানে আমরা প্রথমে নির্মল দাশের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো ও তারপর ব্যাকরণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা ও বাংলা ব্যাকরণ চর্চা নিয়ে আরও দু-চার কথা বলব।

৩.১০ কালানুক্রমিক বাংলা ব্যাকরণ

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে গত তিন দশকে উল্লেখ্য ব্যাকরণের সংখ্যা ও তারই দু-একটি করে নাম এখানে উল্লিখিত হবে।

৩.১০.১ অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ব্যাকরণের সূত্রপাত বিদেশিদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে, বিদেশি পোর্তুগিজ মনোএল আস্‌সুম্প সাঁউ প্রণীত ব্যাকরণের হাত ধরে, ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এর পরবর্তী ব্যাকরণ ১৭৭৮-এ প্রকাশিত হ্যালহেডের ব্যাকরণ। দুটিই বিদেশি ভাষায় রচিত।

৩.১০.২ ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ও বাংলা রচিত অসংখ্য বাংলা ব্যাকরণ রয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রায় তেরটি বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়— যার প্রণেতাগণ বিদেশি ও দেশি বাঙালি উভয়েই।

বিদেশিদের মধ্যে দুটি নাম হল শতাব্দীর প্রথম ১৮০১ এ প্রকাশিত উইলিয়াম কেরির বাংলা ব্যাকরণ। আর শতাব্দী শেষে ১৮৯১ প্রকাশিত জন বিমসের ব্যাকরণ।

দেশি বৈয়াকরণদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রামমোহন রায়, তাঁর ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণের প্রকাশকাল ১৮২৬।

উনবিংশ শতকে বাংলায় রচিত ব্যাকরণগুলির সূত্রপাত ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্তদেবের ব্যাকরণ দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রচিত প্রায় বারোটি ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈয়াকরণদের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতো দেশীয় পণ্ডিতগণ আছেন, তেমনই আছেন রেভারেণ্ড জেকিথ ও জন রবিনসনের মতো বিদেশি ব্যক্তিত্ব।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধের বাংলায় রচিত ব্যাকরণগুলির সূত্রপাত ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্তদেবের ব্যাকরণ দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় রচিত প্রায় বারটি ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বৈয়াকরণদের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতো দেশীয় পণ্ডিতগণ আছেন, তেমনই আছেন রেভারেণ্ড জেকিথ ও জন রবিসনসনের মতো বিদেশি ব্যক্তিত্ব।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধের বাংলায় রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলি প্রধানত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ এবং সংখ্যায় অনেক।

পঞ্চাশের দশকে প্রায় দশটি ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন শ্যামাচরণ সরকার।

ষাটের দশকে প্রকাশিত প্রায় তেইশটি ব্যাকরণ। এর মধ্যে লোহারাম শিরোরত্নের বাঙ্গালা ব্যাকরণের বত্রিশটি ও প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তীর সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণের পঁয়ত্রিশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

সত্তরের দশকে উনত্রিশটি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। আশি ও নব্বই এর দশকের উল্লেখ্য ব্যাকরণ প্রায় আঠেরটি। এর মধ্যে উল্লেখ্য নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হৃষীকেশ শাস্ত্রী ইত্যাদি।

এই আশি নব্বইয়ের দশক থেকেই বাঙালির ব্যাকরণ-সচেতনতার চেহারা বদলাতে শুরু করে। চিন্তাশীল বৈয়াকরণদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার নিজস্ব আবেদন প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং তারই পাশাপাশি ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে এ যাবৎকাল অবধি রচিত বাংলা ব্যাকরণ সমূহের সীমাবদ্ধতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণির লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত হইয়াছে, একটি মুগ্ধবোধ প্যাটেন্ট, গ্রন্থকার মাষ্টারগণ।... এক প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা আর এক প্যাটেন্টে ইংরেজি রুলগুলির তর্জমান।"

হৃষীকেশ শাস্ত্রী তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯০০) এর বিজ্ঞাপনে লেখেন—"আজ পর্যন্ত যতগুলি বাঙ্গালা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদায়কে সাধারণত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণির ব্যাকরণগুলি, সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া রচিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী নিয়মে

পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণির ব্যাকরণগুলি ইংরাজী ব্যাকরণের পদানুসরণে রচিত। সুতরাং উভয় শ্রেণির ব্যাকরণকে এক প্রকার লক্ষ্যভ্রষ্ট বলিলেই চলে।"

বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের পাশাপাশি দেখা যায় বাংলা চলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতাও।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম যুগে যখন বিদেশিদের বাংলা শেখানোর জন্য ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল তখন ব্যাকরণ ছিল কথ্য ভাষা ভিত্তিক। কিন্তু সাহিত্যে সাধুভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ অনুযায়ী এবং বাংলা সাধুভাষার বিশ্লেষণ ভিত্তিক।

'সবুজপত্র' পত্রিকার যুগে প্রথম চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বাংলা চলিত ভাষা সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র পায়, এই ঘটনারই সুদূরপ্রসারী ফল বাংলা ব্যাকরণে চলিত ভাষা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও কালক্রমে ব্যাকরণ চলিত ভাষার সংযুক্তি ও প্রাধান্য।

৩.১০.৩ বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতকে প্রথমে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ, বানান পদ্ধতির সরলীকরণ ও মান্যীকরণ ও চলিত ভাষার সপক্ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সভায় প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধরী, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রশান্ত চন্দ্র মহলনাবীশ, রাজশেখর বসু ইত্যাদি ব্যক্তিত্ববর্গ। উপরন্তু এই দেশজ নতুন ভাবনার পালে জাগে বিদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার আরেক নতুন হাওয়া।

এই নতুন পুরাতনের টানা পোড়েনের ফলে বিশ শতকের ব্যাকরণ চর্চার দুটি সমান্তরাল ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় আছে প্রথাগত ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ। এখানে দু-একটি ব্যতিক্রমী ব্যাকরণ ছাড়া বাকি সবই আগের শতকের ব্যাকরণগুলির অনুরূপ। দুটি ব্যতিক্রমী ব্যাকরণ হল (১) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয়ের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯) এর একটি সরল সংস্করণ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ যা মূলত বর্ণনামূলক তত্ত্বের অনুসরণের রচিত। (২) পবিত্র সরকারের ভাষা জিজ্ঞাসা (১৯৮৯) যা বর্ণনামূলক তত্ত্ব ও স্কুলপাঠ্যক্রমক মেলানোর একটি সদর্থক প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় ধারাটিকে বলা যায় আধুনিক ব্যাকরণ ভাবনা ধারা। এই ধারার আবার দুটি উপধারা বর্তমান একটি উপধারায় রয়েছে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সোচ্চার যে সব চিন্তাবিদ্, যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিশ শতকের শুরুতেই, তাঁদের এবং তাঁদের মতো আরও অনেকের নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ফসল প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদি। যেমন-রবীন্দ্রনাথের বই শব্দতত্ত্ব, বাংলাভাষা পরিচয়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ বাঙালা কৃৎ ও তদ্ধিত, কারণ-প্রকরণ, না, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ কথার কথা, ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ব্যাকরণ বিভীষিকা ইত্যাদি। এই ধারার প্রবন্ধ পুস্তকে বাংলা ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নয়।

দ্বিতীয় উপধারা পুরোপুরি পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রভাবিত। এই উপধারা পুষ্ট হয়েছে মূলত তাঁদের দ্বারা যাঁরা পাশ্চাত্যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পাঠগ্রহণ করে সেই জ্ঞান বাংলা-ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ফলে এই উপধারার বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই প্রতিফলনে গড়ে ওঠে বাংলার তুলনামূলক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, সঞ্জননী

ব্যাকরণ, ভাষাশিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ, উপভাষা-সমাজ ভাষার বিশ্লেষণ ইত্যাদি। তবে এই উপধারার প্রবন্ধ-পুস্তকাদিও মূলত ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে সম্পাদিত গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ। দু-চারটি ভিন্ন ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ। ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই। এই ধারাটিকেই অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট অর্থে বলা যায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।

এবার একটু তাকানো যাক আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিফলনের দিকে।

৩.১১ তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

এই তুলনামূলক ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ভর প্রধান এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থ হল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের The origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬), পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১৯৭৬)। এছাড়াও আছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রীনাথ সেন, যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদির প্রবন্ধ ও গ্রন্থ।

বাংলা ব্যাকরণের তুলনামূলক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে যাঁদের ভাবনা চিন্তা গবেষণা পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে তাঁদের কয়েকটি নাম-মহম্মদ আব্দুল হাই, সুনীল চৌধুরী, পুণ্যশ্লোক রায়, পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত, হুমায়ুন আজাদ ইত্যাদি।

৩.১২ বর্ণনামূলক বাংলা ব্যাকরণ

তুলনামূলক তত্ত্ব থেকে বর্ণনামূলক তত্ত্বে উত্তরণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৩৯)। এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহৃত না হলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতি মূলত বর্ণনামূলকই। নির্মল দাশের মতে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার একটি নব পর্যায়ের শুরু এই ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তাঁর মতে, "এর লক্ষণ প্রয়োজনমতে ইংরেজি ও সংস্কৃতের সাপেক্ষতা করে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা।"

আরেকটি উল্লেখ্য বর্ণমামূলক ব্যাকরণ হল পুণ্যশ্লোক রায়ের Bengali Language Handbook (১৯৬৬)।

এই বর্ণনামূলক ধারার আর একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হল ভাষা শিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ রচনা। এই ধারায় দুটি উল্লেখ্য গ্রন্থ হল ই.সি.ডিমক, সোমদেব ভট্টাচার্য ও সুহাস চ্যাটার্জীর সম্মিলিত ব্যাকরণ Introduction to Bengali (১৯৬৪) ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও অশ্রু কুমার বসু An Intensive course in Bengali (১৯৮১)।

বর্ণনামূলক তত্ত্বে বাংলার বাংলা ও ইংরেজিতে আরো অনেক বিশ্লেষণ হয়েছে ও হচ্ছে। রচিত হচ্ছে বাংলা ভাষা শিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ ও self taught বা নিজে শেখো ধরনের বিশ্লেষণাত্মক বইও—

গবেষণামূলক ব্যাকরণচর্চায় বর্ণনামূলক তত্ত্বের প্রয়োগ আজ অনেক ব্যাপকতর হলেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সরলভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের ছাঁদই অদ্যাবিধি অব্যাহত। কোনো তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায় না।

৩.১৩ সংবর্তনী-সঞ্জননী বাংলা ব্যাকরণ

বাংলায় সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত প্রবাল দাশগুপ্তর প্রবন্ধ চমস্কি, হালি, নত্ববিধান এবং ইত্যাদি তে ১৯৭১-এ। পরবর্তীকালে সত্তর, আশি ও নব্বই এর দশক জুড়ে অদ্যাবিধি বাংলা ও ইংরেজিতে অজস্র প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখেছেন পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে কিন্তু আজও এ ধারায় কোনো সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই।

৩.১৪ উপভাষাতত্ত্ব ও সমাজ ভাষাতত্ত্ব

বাংলা উপভাষা ও সমাজভাষার ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখ নাম হল মহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপা হালদার, সুকুমার সেন, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নির্মল দাশ ইত্যাদি।

৩.১৫ বাংলা ভাষাতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতকের আর একটি অবদান হল বাংলা ভাষাতত্ত্বের টেক্সট বই রচনা। এর মধ্যে উল্লেখ হল—হেমন্ত কুমার সরকারের ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯২৩)—এটিই প্রথম বই। পরবর্তী যুগে বহুল প্রচলিত সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯), ও রামেশ্বর শ-র সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৯৮৪)। এগুলি গবেষণামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ছাত্রপাঠ্যরূপ।

৩.১৬ এক নজরে বিংশ শতাব্দী

বিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চার ধারা রেখাচিত্রের নিম্নরূপভাবে দেখা যায় ঃ

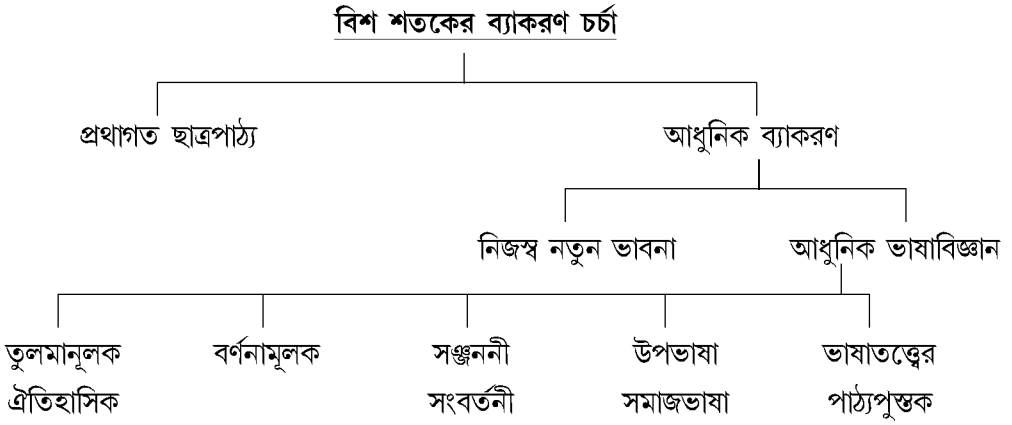

এর মধ্যে আধুনিক ব্যাকরণের ধারাটি সম্পূর্ণ গবেষণামূলক।

ঊনবিংশ শতকের শেষ সীমায় বাংলা ব্যাকরণচর্চা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলছেন—"ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না, উহা আবিষ্কার করে মাত্র। ..... ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্তত হইবে, ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে, তাহাতে ভয় কি ? ..... প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য, উহা

বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়মে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা।"

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ব্যাকরণচর্চায় তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সময়ের ব্যাকরণচর্চার দুটি সমান্তরাল ধারার মধ্যে প্রথাগত ছাত্রপাঠ্য ধারাটি 'বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত', এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারাটি হল ব্যাকরণ নামের বিজ্ঞানশাস্ত্র, যার উদ্দেশ্য 'ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার কর।' এই দ্বিতীয় ধারার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ চর্চার উত্তরণ বিশ্লেষণের এক অন্যতম স্তরে, এবং তারই হাত ধরে সূচনা বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসার এক মহত্তর পর্যায়ের।

৩.১৯ সারাংশ

এই এককে অংশত সাধারণত পরিপ্রেক্ষিতে এবং অংশত বাংলা ভাষার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণচর্চার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি হল—

১। সংস্কৃত গ্রিক-লাতিন ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত।

২। সংস্কৃত গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণের আদর্শে আধুনিক ভাষাসমূহে প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্ভব।

৩। প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা।

৪। বাংলা ও ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা।

৫। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত ও তার বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিবর্তন।

৬। তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব।

৭। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

৮। সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব।

৯। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ চর্চা—অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী।

১০। বিংশ শতকের বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণের পাশাপাশি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা।

৩.১৮ অনুশীলনী

১। **টীকা লিখুন ঃ**

ক) অষ্টাদশ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চা।

খ) বাংলা আধুনিক ব্যাকরণে নিজস্ব নতুন ভাবনা ধারা

গ) গ্রিক ব্যাকরণ

ঘ) বাংলা সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণচর্চা

ঙ) ভাষা পরিকল্পনা

চ) তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ব্যাকরণ

২। **অল্প কথায় পরিচয় দিন ঃ**

ক) সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

খ) বিদেশি রচিত বাংলা ব্যাকরণ

গ) ধ্বনিতত্ত্ব

ঘ) সংস্কৃত ব্যাকরণ

৩। ক) উদাহরণ সহযোগে বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বুঝিয়ে দিন।

খ) ঊনবিংশ শতকের বাংলা ব্যাকরণচর্চার পরিচয় দিন।

গ) আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝেন ? আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিন।

ঘ) বাংলা আধুনিক ব্যাকরণ চর্চার বর্ণনা দিন।

৪। ক) উদাহরণ সহযোগে প্রথাগত ব্যাকরণের সমস্যা ও তার কারণ আলোচনা করুন।

খ) বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিভাগগুলির বিস্তারিত পরিচয় দিন।

গ) বিংশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার বর্ণনা দিন।

ঘ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ব্যাকরণ চর্চার রূপরেখা বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। নির্মল দাশ, ১৯৮৭, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ।

২। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

৩। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টান পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪। Gleason, H. A. 1961. An Introduction to Descriptive Linguistics. Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.